Dr. Zakir Naik's Bangla Ebook

ISLAMIC LABEL

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা

প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর রয়েছে নিজস্ব পরিচিতি, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বকীয়তা। তাই বস্তুর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে এর গায়ে লাগিয়ে দেয়া হয় লেবেল। আর একই গোত্রভুক্ত প্রাণীদের মধ্যেও রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য। যেমন কুহু কুহু ধ্বনি শুনলেই আমরা বুঝতে পারি কোকিল ডাকছে; কা কা ধ্বনি মনে করিয়ে দেয় কাকের কথা। অনুরূপভাবে আকৃতি, বর্ণ, চাল-চলন ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা কোনো একটি বিশেষ প্রাণীকে চিনতে সক্ষম হই। মানুষের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম নয়।

আচার-আচরণ, চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতিতে মানুষে মানুষে রয়েছে ভিন্নতা। এই ভিন্নতার কারণেই মানুষ বিভিন্ন গোত্র ও সংস্কৃতিবদ্ধ মানুষে পরিণত হয়। সে একটি বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। এই স্বতন্ত্রবৈশিষ্ট্য বা বিশেষ পরিচিতিই হচ্ছে লেবেল।

ঐক্যের প্রতীক লেবেল–সবচেয়ে মর্যাদাবান প্রাণী হচ্ছে মানুষ। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো প্রতিটি মানুষের চেহারা-ই আলাদা। একজনের চেহারার সাথে অপর জনের মিল নেই। লেবেল এই বিভাজনকে যুথবদ্ধ করে। অনেকগুলো ফুলের সমন্বয়ে গাঁথা হয় একটি মালা। তাই লেবেলকে আপাতদৃষ্টিতে বৈশিষ্ট্য বিভাজক মনে হলেও এটা মূলত ঐক্যের প্রতীক। আর একজন মুসলিম যেহেতু বিশ্বমুসলিমের অংশ তাই তাকেও একটি সুনির্দিষ্ট লেবেল ধারণ করতে হয়। ইসলাম এই লেবেলটাকে বেশ সৌকর্যময় করে উপস্থাপন করেছে, যা কেবল কালোত্তীর্ণ নয়– বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই অনন্য প্রমাণিত হয়েছে।

আপনারা ভাবতে পারেন, ইসলামে লেবেলের গুরুত্বটা আসলে কী? হয়তো এ বিষয়টি সম্পর্কে একটু কৌতুহলী হবেন। এটাই স্বাভাবিক।

সম্ভাষণ

সম্ভাষণ লেবেলের অন্যতম উপাদান। এটি মানব সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

সূরা আনআমের ৫৪ নং আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে–

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

অর্থ : আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি বলে দিন ঃ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা রহম করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে, অনন্তর তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়।

একজন মুসলিম ও একজন মু'মিনের সাথে অপর মুসলিম ও মু'মিনের দেখা হলে সে বলবে– আসসালামু আলাইকুম– আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

সালাম বিনিময়ের রীতি সম্পর্কে সূরা নিসা-এর ৮৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا -

অর্থ : আর তোমাদেরকে যদি কেউ দুআ করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দুআ কর; তারচেয়ে উত্তম দুআ অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী।

তার মানে যখনই কেউ আপনাকে বিনয়ী ভাষায় অভিবাদন করবে আপনিও অন্তত পক্ষে অনুরূপ বিনয়ী আচরণ করবেন। এটা আবশ্যিক। যেমন ধরুন, কেউ আপনাকে বলল– 'আসসালামু আলাইকুম।' তখন আপনি বলবেন, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম।' আবার কেউ যদি বলে, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ', তখন আপনি বলবেন– 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আর ওয়া বারাকাতুহু বললে আরো ভালো।' অর্থাৎ, আল্লাহর দয়া, শান্তি ও রহমত আপনাদের সকলের ওপর বর্ষিত হোক।

অথবা কেউ যদি একটু নরম সুরে বলে, 'আসসালামু আলাইকুম'। তখন আপনি হৃদয়ের গভীর থেকে বলুন– 'ওয়াআলাইকুমুস সালাম'। যদিও এখানে শব্দগুলো একই, তারপরও এটা অনেক বিনয়ী অভিবাদন। কারণ আপনি শব্দগুলো মনের গভীর থেকে উচ্চারণ করেছেন। আন্তরিকতার সাথে শুভকামনা করেছেন।

অন্ততপক্ষে একইরকম বিনয়ী আচরণ বা সম্ভাষণই ইসলামের ভূষণ। তবে মুসলিমদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা কোনো কোম্পানির মালিক; যাদের অধীনে অনেক লোক কাজ করে– সেখানে যখন কর্মচারী মালিককে সালাম দিয়ে বলে– 'আসসালামু আলাইকুম' তখন তারা মাথা নাড়ায়। অথবা বলে, 'ওয়া আলাকুম সালাম'। অনেকে এই সালামের কোনো উত্তর দেয় না। এ ধরনের মুসলমানরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আদেশ অমান্য করছে।

পবিত্র কুরআনের সূরা নিসা-এর ৮৬ নম্বর আয়াতে এদের সম্ভাষণ রীতিকে বয়কট করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে–

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا -

অর্থ : আর তোমাদেরকে যদি কেউ দুআ করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দুআ কর; তারচেয়ে উত্তম দুআ অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী।

প্রচলিত অভিবাদন

Good Morning

বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে অভিবাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও রীতি রয়েছে। এবার সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। এসব অভিবাদনের মধ্যে অতি প্রচলিত সম্ভাষণটি হলো– 'Good Morning'.

বাংলায়– শুভ সকাল বা সুপ্রভাত।

আফ্রিকান ভাষায় বলা হয়– 'খোইয়ামুরা আসাকাবান'।

চিনা ভাষায়– 'চাওসুং'।

অর্থাৎ, বেশিরভাগ সামাজেই 'Good Morning' অভিবাদনটি বেশ common। কিন্তু এই অভিবাদনটি কতটা বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী আবেদনময়ী।

ধরুন, সাত সকালেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এ সময় আপনাকে অভিবাদন করা হলো, "Good Morning" বলে। অথবা একটানা বৃষ্টি হচ্ছে, শহরে পানি জমে গেছে তারপরও আপনাকে বলা হচ্ছে, "Good Morning" বা শুভ সকাল। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে সকালটা শুভ বলা হচ্ছে কেন?

তবে আমরা যখন স্কুলে যাই (যদি স্কুলটা কোনো ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল হয়ে থাকে) তাহলে প্রতিটি প্রিয়ডের শুরুতেই শিক্ষক ক্লাসে ঢোকার সময় সকল ছাত্র দাঁড়িয়ে বলতে থাকে- "Good Morning, Sir" এটা আবশ্যিক।

কিন্তু এমন যদি হয় ঐ শিক্ষক ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করেছেন। ধরুন, ঘটনাটা সকালের; তিনি হয়তো স্কুলে আসতে আসতে স্ত্রীকে অভিশাপ দিচ্ছেন আর মনে মনে ভাবছেন, আর জীবনেও স্ত্রীর সাথে কথা বলবেন না। কিন্তু তারপরেও যদি কেউ তাকে "Good Morning, Sir" বলে, তাহলেও উত্তরে তিনি বলবেন, "Good Morning"। যদিও সকালটা তার জন্য ছিল খারাপ, তারপরও তিনি বিষণ্ন বদনে জবাব দিবেন- "Good Morning" কিন্তু যখন সকালেই স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়েছে! এ সকালটাকে "Good Morning" বলার কারণ কি? এ বাক্যটি কতটুকু যৌক্তিক? এই সম্ভাষণগুলো কি সবসময় ব্যবহার উপযোগী?

Hi

আমাদের তরুণ সমাজে আরেক প্রকার অভিবাদনের প্রচলন আছে। স্কুল-কলেজে পড়ে এমন ছেলে মেয়েরা অভিবাদন জানাতে গিয়ে বলে-"Hi!" আর কাউকে যদি তার বন্ধু অভিবাদন জানিয়ে "Hi!" বলে, উত্তরে অন্য বন্ধুও দীর্ঘ উচ্চারণে বলে-Hi(g)h, তাকে যদি তখন জিজ্ঞেস করেন, এই "High" শব্দের অর্থ কী? তাহলে কেউ এর উত্তর দিতে পারবে না। স্থানীয় হিন্দী ভাষায় এই "হাই" শব্দটা আফসোস করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি "High" অর্থ যে জিনিসটা উপরের অবস্থানে আছে। এছাড়া এগুলো ছাড়াও সমাজে প্রচলিত এই 'হাই' শব্দটির আরো একটি অর্থ হলো 'মাদকে বুঁদ হওয়া'। ভারতীয় সমাজের অনেক লোকেই মাঝে মধ্যে বলে থাকে- একটি পার্টিতে গিয়েছিলাম, তারপর "হাই" হয়ে গিয়েছিলাম বা মাদকাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। এটা কি ভদ্র অভিবাদন? আমার মতে, এটা কোনো অভিবাদনই নয়। তাহলে এই "Hi" শব্দটা কোনোমতেই অভিবাদন হিসেবে গণ্য করা যায় না।

Hello

এগুলো ছাড়াও সমাজে আরো একটি অভিবাদন প্রচলিত আছে, সেটি হলো 'Hello'। Oxford Dictionary- তে এই "Hello" শব্দটার অর্থ করা হয়েছে 'অনানুষ্ঠানিক অভিবাদন'। অন্য আরেকটা অর্থে টেলিফোনে 'যে শব্দ দিয়ে কথা বলা শুরু করা হয়।' এই শব্দটার প্রচলন শুরু হয় টেলিফোন আবিষ্কারক বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল থেকে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, একবার গ্রাহামবেল ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন, আর তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠল। এ সময় কথাবার্তা শুরু করার জন্য তিনি বলেছিলেন,-'Hello', শব্দটি তিনি এমনভাবে বলেছিলেন যেন অপর প্রান্তের লোক তার কথা শুনতে পারেন, আর তিনিও দ্রুত বের হতে পারেন। তখন থেকেই এই 'Hello' বলার প্রচলনটা শুরু হয়েছে। আর এখন এটি একটি প্রচলিত সম্ভাষণ; যদিও এর নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই। তবে আমরা আজও টেলিফোনে এভাবে কথা বলা শুরু করি। 'Oxford', অভিধান বলছে- এই 'Hello' শব্দটা কথা-বার্তার শুরুতেই বলা হয়। এমনকি মোবাইল ফোনে কথা শুনতে অসুবিধা হলে বা কথার মাঝখানে 'Hello' বলা হয়।

আসসালামু আলাইকুম-সর্বোত্তম সম্ভাষণ

সম্ভাষণের মধ্যে সর্বোত্তম অভিবাদন হলো ইসলামী রীতির অভিবাদন- আসসালামু আলাইকুম। হতে পারে সেদিন বৃষ্টি হচ্ছে, অথবা স্ত্রী বা বন্ধুর সাথে বাক-বিতণ্ডা হয়েছে। অর্থাৎ, সুখে-দুঃখে, মান-অভিমানে, ছোট-বড় সকল পর্যায়েই 'আসসালামু আলাইকুম' অর্থাৎ, 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'-এটাই একমাত্র সঠিক অভিবাদন।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, পশ্চিমা বিশ্বের লোকেরাও যীশুখ্রিস্টের অভিবাদন ব্যবহার না করে। 'Hello' শব্দটা অথবা অন্য সব অভিবাদন ব্যবহার করেন। বাইবেলের নিউটেস্টামেন্টে 'গসপেল অব লুক'-এর ২৪ নং অধ্যায়ের ৩৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- 'সেই (তথাকথিত) ক্রুসিফিকশান-এর পর যীশুখ্রিস্ট তাদেরকে হিব্রু ভাষায় অভিবাদন জানিয়েছিলেন। উপরের ঘরে শিষ্যদের সাথে দেখা করতে গিয়ে তিনি 'সালামালাইকুম' বলে তাদেরকে (হিব্রু ভাষায়) অভিবাদন জানিয়েছিলেন।' যদি সালামালাইকুম শব্দটি হিব্রু থেকে আরবি করা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় 'আসসালামু আলাইকুম'; অর্থাৎ, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। সার্বিক বিবেচনায় অভিবাদনের মধ্যে সবচেয়ে 'smart' এবং সর্বজনীন অভিবাদন হচ্ছে- আসসালামু আলাইকুম।

সালাম বিনিময় রীতি

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স) সবসময় লোকজনকে আগে অভিবাদন জানাতেন। সেই সময় নবীজির অনেক সাহাবী চেষ্টা করেছেন নবীজিকে আগে সালাম দিতে, কিন্তু কখনোই সফল হননি। আলহামদুলিল্লাহ, নবীজি সবসময় আগে সালাম দিতেন।

সহীহ মুসলিমের তৃতীয় খণ্ড 'বুক অব সালাম' অধ্যায়ে হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত ৫৩৭৪ নম্বর হাদিসে উল্লেখ আছে, 'নবী করিম (স) বলেছেন, আরোহী আগে অভিবাদন জানাবে পথচারীকে আর পথচারী অভিবাদন জানাবে তাকে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। ছোট দল অভিবাদন জানাবে তার চেয়ে বড় দলকে।

তার মানে কোনো লোক যদি ঘোড়া বা অন্য কোনো কিছুর ওপর অথবা কোনো গাড়িতে থাকেন তিনি যে লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন তাকে অভিবাদন জানাবেন। আর পথচারী প্রথম অভিবাদন জানাবে সেই লোকদের যারা দাঁড়িয়ে বা বসে আছে। একইভাবে ছোট দল বড় দলকে অভিবাদন জানাবে। নবীজী বলেছেন, তরুণরা প্রথমে অভিবাদন জানাবে গুরুজনদেরকে। যে লোক সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে সে প্রথমে সিঁড়ি দিয়ে যে লোক উপরে উঠছে তাকে অভিবাদন জানাবে।

সালাম বিনিময় রীতি সম্পর্কে সূরা আনআমের ৫৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۔

অর্থ ঃ আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি বলে দিন ঃ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা রহম করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে, অনন্তর এরপরে তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়।

সহীহ মুসলিম এর তৃতীয় খণ্ড 'বুক অব সালাম' অধ্যায়ের ৫৩৭৮ নং হাদিসে আরো উল্লেখ আছে– মহানবী (স) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের তার ভাইদের

কাছে অধিকার রয়েছে, আর তা হলো তিনি অভিবাদনের উত্তর পাবেন। অর্থাৎ- যখন কেউ বলবে, আসসালামু আলাইকুম তখন তার ভাই প্রতি উত্তরে কমপক্ষে বলবে– ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

তাছাড়া আমরা জানি, একজন মু'মিন তার ভাইয়ের কাছ থেকে মোট ছয়টি অধিকার লাভ করে।

প্রথমটা হলো, সালামের উত্তর প্রদান করা।

পরেরটা হলো, কেউ যদি হাঁচির উত্তরে আলহামদুলিল্লাহ বলে তখন একজন মুমিন ব্যক্তিকে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলতে হবে।

তৃতীয়টি হলো, রোগিকে দেখতে যাওয়া বা তার সেবা শুশ্রূষা করা।

চতুর্থটি হলো, কেউ দাওয়াত করলে তার দাওয়াত গ্রহণ করা।

পঞ্চমটি হলো, ওয়াদা করলে ওয়াদা রক্ষা করা।

আর ষষ্ঠটি হচ্ছে, জানাযায় শরীক হওয়া।

আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাতে সালাম বিনিময়ের বিধান রয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের একাধিক নির্দেশ সালামের বিধানকে গুরুত্ববহ করেছে। সালাম অর্থ শান্তি, সুখ, নিরাপত্তা, শুভেচ্ছাকামনা ইত্যাদি। সমাজের সকল মানুষের মাঝে বিশেষত মুসলিম সমাজে পরস্পর সালাম বিনিময়ের মধ্য দিয়ে শান্তিকামনা ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তা ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পর থেকে দূরীভূত হয় বিদ্বেষ ও অহঙ্কারের মতো অশান্তি সৃষ্টিকারী ভাইরাসসমূহ। পরস্পরের মাঝে গড়ে ওঠে ভ্রাতৃত্বের সৌধ। বৃদ্ধি পায় আন্তরিকতা, জাগে পারস্পরিক সহানুভূতি। সৃষ্টি হয় সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, সমাজে বিরাজ করে সুখ-শান্তি। তাই আপাতদৃষ্টিতে 'সালাম' মুসলিম সংস্কৃতির রীতি-নীতির বিষয় মনে হলেও এর রয়েছে বহুবিধ তাৎপর্য। এটা শুধু মুসলিম সমাজের পরিচয়ের নিদর্শনই নয় অন্যতম ভূষণও বটে। সম্ভাষণ তথা সালামকে তাই মুসলিম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ লেবেল বা পরিচ্ছদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

আমাদের নবীজী মুহাম্মদ (স) এটাই শিখিয়েছেন। এখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ আমরা কীভাবে মেনে চলব সেটাই বিবেচ্য। তাহলে প্রশ্ন হলো নবীজীর এ আদেশ আমরা কীভাবে মেনে চলবো, যদি বুঝতেই না পারি আমার সামনে যে লোকটা আছেন তিনি মুসলিম না অমুসলিম? আর কীভাবেই বা বুঝতে পারবো যে লোকটা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস এনেছে?

পোশাকে প্রকাশ পায় পরিচয়

ধরা যাক, একটা কনফারেন্স এর কথা। আমরা জানি, বেশির ভাগ কনফারেন্সের প্রতিনিধিরাই বিশেষ ব্যাজ পরেন। ব্যাজের মধ্যে তাদের নাম ও পদমর্যাদা কিংবা যেখান থেকে তিনি এসেছেন সে জায়গার নাম লেখা থাকে। যদি কনফারেন্সটা হয় পেশাজীবীদের তাহলে ব্যাজটিতে ঐ ব্যক্তির পেশা লেখা থাকতে পারে, যেমন– ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা অ্যাডভোকেট। হতে পারে কনফারেন্সটা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের চিকিৎসাক্ষেত্র সম্পর্কে লেখা আছে। যেমন ঃ কার্ডিওলোজিস্ট বা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, নিউরোলোজিস্ট বা মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ, ইউরোলোজিস্ট বা কিডনি বিশেষজ্ঞ, পেডিয়াট্রিসিয়ান বা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, গাইনোকোলোজিস্ট বা প্রসূতিরোগ বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যদি বুকে ব্যথা অনুভব করেন এবং তিনি যদি হৃদপিণ্ড সম্পর্কে জানতে চান তবে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ব্যাজ দেখে যিনি 'কার্ডিওলোজিস্ট' তাকে প্রশ্নটা করবেন। আবার কেউ যদি মস্তিষ্ক সম্পর্কে জানতে চান তিনি প্রশ্ন করবেন নিউরোলোজিস্ট-এর কাছে।

অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের ব্যাজটা তার পরিচিতি হিসেবে কাজ করছে যেটা দেখে উক্ত চিকিৎসকের কাছে তার বিষয়সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করা হচ্ছে। সুতরাং বাহ্যিক ভূষণ যে কোনো ব্যক্তির বিশেষ পরিচয় বহন করে। এক কথায় বলা যায়, The lable shows your intent। তাই যদি পোশাক দিয়ে উদ্দেশ্য বোঝা যায়, তবে সেটাই পরা উচিত। স্বভাবতই আমাদের মুসলিমদের বাহ্যিক ভূষণ থাকা প্রয়োজন যেটা দেখে অতি সহজে বুঝা যাবে যে তিনি একজন মুসলিম। যেমন, একজন মুসলিম যদি একটি ব্যাজ পরেন যেখানে اَللّٰهُ (আল্লাহ) অথবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) লেখা, তাহলে যে কোনো ব্যক্তিই তাকে দেখে সহজেই চিনতে পারবেন। এমনও হতে পারে যে, কোনো অমুসলিম উক্ত ব্যাজ দেখে সেটা সম্পর্কে জানতে কৌতূহলী হবেন। সেক্ষেত্রে উক্ত মুসলিম তার অমুসলিম ভাইটিকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ারও সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু একজন মুসলিমের পক্ষে এভাবে সবসময় বাহ্যিক ভূষণ হিসেবে ব্যাজ লাগিয়ে রাখা শোভন নয়। আর এটা অসম্ভবও বটে। সুতরাং মুসলিমদের এমন একটা লেবেল থাকা উচিত যা মুসলিমরা বহু বছর ধরে অনুসরণ করে আসছে। আর তা হলো দাড়ি রাখা এবং টুপি পরা। সুতরাং মুসলিমরা বাহ্যিক ভূষণ হিসেবে দাড়ি রাখতে পারেন এবং টুপি পরতে পারেন।

দাড়ি মুসলিম পুরুষের ভূষণ

প্রথমেই প্রশ্ন আসতে পারে, ইসলামে টুপি পরা ও দাড়ি রাখা কতটুকু প্রয়োজনীয়? আল্লাহ তাআলার কাছে নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়ার জন্য কি টুপি পরতেই হবে কিংবা দাড়ি রাখতেই হবে? উত্তরে বলা যায়, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, তিনি সব জানেন। তাই কোনো ব্যক্তিকে মুসলিম হিসেবে চিনতে হলে, তার দাড়ি ও টুপি দেখে চিনতে হবে এটা আল্লাহ তাআলার জন্য জরুরী নয়। তিনি তো অন্তর্যামী। এটা আল্লাহর জন্য নয়, মানুষেরই জন্য জরুরী। বস্তুত কোনো ব্যক্তিকে দেখে তাকে মুসলিম হিসেবে আমরা তখনই সহজে চিনতে পারব যখন দেখব তার দাড়ি আর টুপি আছে।

যদিও পবিত্র কোরআনে সরাসরি দাড়ি রাখা বা টুপি পরার কথা বলা হয়নি। তবে পবিত্র কুরআন এর সূরা 'ত্বহা'র ৯৪ নম্বর আয়াতে এ সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে–

মুসা (আ) তাঁর কওমের (গোষ্ঠির) নিকট ফিরে এসে যখন দেখলেন তাঁর কওম গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন তিনি হারুন (আ)-কে প্রশ্ন করলেন এবং হারুন (আ) জবাব দিলেন–

'হে আমার মায়ের ছেলে! আমার দাড়ি ধরো না এবং আমার মাথার চুলও টেনো না।'

অর্থাৎ, এ আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, মুসা (আ) তাঁর ভাই হারুন (আ)-এর দাড়ি ধরেছিলেন। অর্থাৎ হারুন (আ) ছিলেন আল্লাহর নবী এবং তাঁর দাড়ি ছিল। কিন্তু এখানে দাড়ি রাখার ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট হুকুম পাওয়া যায় না। তবে পবিত্র কোরআনে সূরা ইমরানের ১৩২ নং সূরা নিসার ৫৯ নং, সূরা মায়িদার ৯২ নং, সূরা আনফালের ১ নং, ২০ নং, ও ৪৬ নং, সূরা নূরের ৫৪ নং ও ৫৬ নং, সূরা মুহাম্মদের ৩৩ নং, সূরা মুজাদালার ১৩ নং, সূরা তাগাবুনের ১২ নং আয়াতসহ আরো কিছু সংখ্যক আয়াতে উল্লেখ আছে–'তোমরা আল্লাহর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।'

বস্তুত দাড়ি রাখার ব্যাপারে হুকুম এসেছে সহীহ হাদীসে। যেখান থেকে স্পষ্ট যে, রাসূলের আনুগত্য করাটাও আল্লাহর আনুগত্য করার মতোই জরুরি।

এখানে হাদীসে এসেছে, নাফি (রা) উল্লেখ করেছেন, ইবনে উমার (রা) বলেন,

আমাদের নবী করীম (স) বলেছেন– 'পৌত্তলিকরা যা করে তোমরা তার উল্টটা কর। দাড়ি লম্বা করে রাখ এবং গোফ ছোট করে ছাট।'

সহীহ বুখারীর ৭ম খণ্ডে, পঞ্চম অধ্যায়ের 'বুক অব ড্রেস' অংশের ৭৮১ নং হাদিসে উল্লেখ আছে, 'ইবনে উমর (রা) উল্লেখ করেছেন, নবী করিম (স) বলেন, তোমরা গোঁফ ছোট করে কাট আর দাড়ি লম্বা করে রাখ।'

কোনো কোনো ফকীহবিদদের মতে, দাড়ি রাখা মুস্তাহাব এবং কারও কারও মতে সুন্নতে মুআক্কাদাহ। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। এ কারণে রাসূল (স) এর নির্দেশ পালন করা ফরয। সুতরাং দাড়ি রাখা মুসলমানদের জন্য ফরয।

এখন দাড়ি রাখা ফরয হোক বা মুস্তাহাব-ই হোক একজন প্রকৃত মুসলিম দাড়ি রাখবে, এটাই স্বাভাবিক। কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-কে ভালোবেসে দাড়ি রাখে, তাহলে ঐ ব্যক্তির মুখে দাড়ি মানাক বা না মানাক সে সওয়াব পাবে। কিন্তু দেখা গেল কোনো একজন দাড়ি রাখলেন কিন্তু এই দাড়ি তার মুখের সৌন্দর্য বাড়াল না তাহলে সে আরও বেশি সওয়াব পাবে। প্রশ্ন হতে পারে, অমুসলিমরাও তো দাড়ি রাখে, তাহলে দাড়ি রাখলেই একজন ব্যক্তিকে কীভাবে মুসলিম হিসেবে সনাক্ত করা যাবে? উত্তর হলো যদি পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে জরিপ করা হয়, তবে দেখা যাবে, যারা দাড়ি রাখে তার ৭৫ শতাংশের বেশি-ই হলো মুসলিম। যেসব অমুসলিম লোক দাড়ি রাখে তাদের দাড়িটা বিশেষ ধরনের হয়, এছাড়াও তারা তাদের বিশেষ ধর্মীয় চিহ্ন যেমন ক্রুস, টিকি ইত্যাদি ধারণ করে যা দেখে সহজেই চেনা যায় এরা অমুসলিম। তাহলে বলা যায়, দাড়ি হচ্ছে মুসলিম পুরুষের ভূষণ।

টুপি মুসলমানদের গৌরব

এখন আসা যাক 'টুপি' বিষয়ে। টুপি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কুরআনে সরাসরি কোনো নির্দেশনা আসেনি । নবী করীম (স)-এর হাদীসেও এ বিষয়ে সরাসরি কোনো নির্দেশ নেই। সুতরাং টুপি পরা ফরয নয়, তবে এটা নবী করীম (স) এর সুন্নাত। সহীহ বুখারীর ৭ম খণ্ডের, 'বুক অব ড্রেস', অনুচ্ছেদ এর ষোড়শ অধ্যায়ের ৬৯৮ নং হাদিসে উল্লেখ আছে; ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'নবীজি যখন আসলেন তখন একটা কালো পাগড়ি পরলেন।'

আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, যখন নবী করীম (স) বাইরে বেরোতেন তখন তিনি কাপড়ের একটা অংশ দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতেন।

সহীহ বুখারীর ৭ম খণ্ডের ১৭ তম অধ্যায়ের 'বুক অব ড্রেস' অংশের ৬৯৯ নং হাদিসে আরো উল্লেখ আছে–

'আনাস বিন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, যে বছর নবীজি মক্কা বিজয় করেন, মক্কায় প্রবেশের সময় তার মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ।'

অর্থাৎ, নবী করিম (স) সবসময় মাথা ঢেকে রাখতেন। এ কারণে যেকোনো কাপড় অথবা টুপি দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা সুন্নত। এছাড়াও টুপি পরার বেশ কিছু উপকারিতা আছে। যেমন, কোনো মুসলিম টুপি পরে থাকলে একজন অমুসলিম ঐ অপরিচিত ব্যক্তিটিকে দেখে হয়ত কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন, সে টুপি পরেছে কেন? এভাবে মুসলিম ব্যক্তিটি ঐ অমুসলিম ব্যক্তিকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার সুযোগও পেয়ে যেতে পারেন।

আগের দিনের লোকেরা টুপি পরা কোনো ব্যক্তিকে দেখলে বুঝতে পারত, তিনি একজন মুসলিম এবং সে বিশ্বস্ত। তাই তারা ঐ মুসলিম ব্যক্তির ওপর তারা আস্থা স্থাপন করত। কিন্তু এখন কতিপয় মুসলিমের অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ডের কারণে টুপি পরা ব্যক্তিদের মাস্তান, জঙ্গি মনে করা হয়। কিন্তু কতিপয় মুসলিমের ভুলের জন্য টুপি পরা বা দাড়ি রাখা ছেড়ে দেয়ার সুযোগ নেই। বরং টুপি পরে ও দাড়ি রেখে একজন ব্যক্তি যদি নিজের মুসলিম পরিচয় প্রকাশ করে এবং সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারির দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, সেক্ষেত্রে এ ধরনের মুসলিমের সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে, তত দ্রুত টুপি সংক্রান্ত এ বদনাম ঘুচে যাবে। মুসলমানদের বাহ্যিক ভূষণের এই গৌরব পুনরুদ্ধার হবে।

দাড়ি-টুপি মুসলিম-অমুসলিম বিভাজক

এমন অনেক মুসলিম আছেন, যারা নিজেদের মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে শঙ্কিত। তারা ইসলাম সম্পর্কিত অমুসলিমদের ভুল ধারণা ও প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে না পেরে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে ভয় পান। এজন্য মুসলিমদের অবশ্যই অমুসলিমদের প্রচলিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নেয়া উচিত। তাহলে তারা মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে ভয় তো পাবেন-ই না বরং অমুসলিমদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া তার জন্য সহজ হবে। নিজেদের পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে শিখ সম্প্রদায়ের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ ধরনের পাগড়ি পরে থাকে ও দাড়ি রাখে। এগুলো হলো তাদের বাহ্যিক ভূষণ যা তারা পরে

এবং এভাবে নিজেদের শিখ হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। এমন কি শিখরা যদি আর্মি, নেভি কিংবা জয়েন্ট ফোর্সে যোগ দেয় সেখানেও তারা তাদের এই ভূষণ ত্যাগ করে না। পাগড়ি পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল কানাডা সরকার। তখন একজন শিখ পাগড়ি পরার জন্য কানাডা সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে এবং সে জিতে যায়। অর্থাৎ, পাগড়ি পরে নিজের শিখ পরিচয় প্রকাশ করার জন্য সে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত করেছে। অথচ কতিপয় মুসলিম নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে শঙ্কিত হন। এমনকি কোথাও চাকরিতে ঢুকতে গেলে যদি শর্ত থাকে যে দাড়ি রাখা যাবে না, তারা তখন দাড়ি কেটে ফেলেন। এ ধরনের ঘটনা খুবই দুঃখজনক।

অথচ টুপি না পরলে এবং দাড়ি না রাখলে অর্থাৎ, নিজের মুসলিম পরিচয় গোপন করলে আপনি অপর কোনো ব্যক্তি কর্তৃক মুশরিক হিসেবেও প্রতিপন্ন হতে পারেন। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেয়া যায় ঃ একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের কথা চিন্তা করুন, যিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন, হজ্জ করেছেন, যাকাত দেন এবং রমযানে রোযাও পালন করেন। অন্য কথায় তিনি একজন খাঁটি মুসলিম কিন্তু তিনি মাথায় টুপি পরেন না এবং তার মুখে দাড়ি নেই। অর্থাৎ, তার ইসলামি বহিরাবরণ নেই। মনে করুন লোকটি একদিন এক ফলের দোকানে গেল ফল কিনতে। দোকানে যাওয়ার পর দোকানদার ছেলেটি তাকে সালাম না দেয়ায় তিনি বিস্মিত হলেন এবং সালাম না দেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ছেলেটি জবাবে বলল, সে ভেবেছিল লোকটি একজন হিন্দু, কারণ লোকটির মুখে দাড়ি কিংবা মাথায় টুপি নেই। অর্থাৎ, ছেলেটি লোকটিকে একজন মুশরিক প্রতিপন্ন করল। একজন মুসলিমের জন্য এর চেয়ে অপমানজনক আর কী হতে পারে যদি তাকে মুশরিক ভাবা হয়। জানা ছিল যে ফলের দোকানের বিক্রেতা একজন মুসলিম। একজন মুশরিকের প্রতিফল সম্পর্কে কুরআনুল কারীম এর সূরা নিসা'র ৪৮ তম আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ـ

'আল্লাহ কেবল শিরকের গুনাহই মাফ করেন না। এছাড়া অন্য যত গুনাহ আছে তা যার জন্য ইচ্ছে তাকে মাফ করে দেন।'

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ـ

অর্থঃ যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেছে, সে তো বড় মিথ্যা তৈরি করল এবং বিরাট গুনাহ করল।

একই সূরার ১১৬ তম আয়াতে উল্লেখ আছে–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ শুধু শিরকের গুনাহই মাফ করবেন না। এছাড়া আর সব গুনাহই মাফ করে দেন, যার বেলায় তিনি ইচ্ছে করেন। যে আল্লাহর সাথে শরিক করল সে তো গোমরাহীতে বহুদূর চলে গেল।

আবার সূরা মায়িদার ৭২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, মাসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ। আর মাসীহ বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর দাসত্ব কর, যিনি আমাদেরও রব, তোমাদেরও রব। নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে আল্লাহ তার জন্য বেহেশত হারাম করে দেন। দোযখই তার ঠিকানা। এখন যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, যদি কেউ শিরক করে এবং সে অবস্থায়ই মারা যায়, তবে সে জাহান্নামে যাবে।

এখন, ভদ্রলোকটির লেবেল না থাকার কারণে যদি তাকে মুশরিক জ্ঞান করা হয় তাহলে ছেলেটি নয় বরং ঐ লোকটিই দোষী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং পোশাক দিয়ে যদি উদ্দেশ্য বা পরিচয় বুঝা যায় তাহলে সেটাই ধারণ করা উচিত।

হিজাব মর্যাদার চাবিকাঠি

হিজাব হলো মুসলিম মহিলাদের লেবেল। হিজাব শব্দের অর্থ আবৃত করা বা ঢেকে রাখা। এটি বিশেষ ধরনের একটি পোশাক যা মুসলিম নারীরা পরিধান করে থাকেন। পবিত্র কুরআনে সূরা নূর এর ৩১ তম আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ

زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۔ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

অর্থ ঃ (নবী!) মুমিন মহিলাদেরকে বলুন, তারা যেন চোখ নিচু রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং তাদের সাজসজ্জা যেন দেখিয়ে না বেড়ায়, ঐ টুকু ছাড়া যা আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর তারা যেন তাদের বুকের ওপর তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে রাখে। তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনদের ছেলে, ঘনিষ্ঠ চেনা-জানা মহিলা, নিজেদের দাস, অধীনস্থ এমন পুরুষ যাদের অন্য কোনো চাহিদা নেই এবং এমন অবোধ বালক, যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে জানে না। তাদের সামনে ছাড়া তারা যেন তাদের গোপনীয় সাজসজ্জা লোকদের জানানোর উদ্দেশ্যে মাটির ওপর জোরে পা ফেলে চলাফেরা না করে। (হে মুমিনগণ!) তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।'

পবিত্র কুরআনে ও হাদিসে হিজাব পালনের নিয়মগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হিজাবের নিয়ম প্রধানত ৬টি । প্রথম নিয়মটি নারীর জন্য পৃথক এবং বাকি পাঁচটি উভয়ের জন্যই এক।

পুরুষ ও নারীর হিজাবের বিস্তৃতি বা সীমা

❒ পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। নারীর জন্য পুরো শরীরটাই ঢেকে রাখতে হবে। শুধু মুখ, হাতের কব্জি এবং (কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতানুযায়ী পায়ের পাতা ব্যতীত)। আবার, অপর কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জিও হিজাবের অন্তর্ভুক্ত।

❒ শরীরের কাঠামো দেখা যায় এমন আঁটসাট পোশাক পরা যাবে না। যেমন ঃ পুরুষদের স্কীন টাইট জিনস পরার অনুমতি নেই।

❒ শরীরের কাঠামো বুঝা যায় এমন স্বচ্ছ পোশাক পরা যাবে না। যেমন ঃ জর্জেট বা এ ধরনের কোনো কাপড় দিয়ে তৈরি পোশাক পরা নিষিদ্ধ।

❒ বিপরীত লিঙ্গের কেউ আকৃষ্ট হয় এমন আকর্ষণীয় পোশাক পরা যাবে না।

❒ অবিশ্বাসীদের বিশেষ কোনো চিহ্ন বোঝায় এমন কোনো পোশাক বা লেবেল পরা যাবে না। যেমন ঃ ক্রুশ, যা খ্রিস্টানদের প্রতীক; কপালে ওঁম লেখা, মাথায় টিকি, যা হিন্দু-ইজমের প্রতীক।

❒ এমন পোশাক পরা যাবে না যা বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের মতো। যেমন ঃ পুরুষদের এক কানে দুল পরার অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই।

নারীদের হিজাব সংক্রান্ত এ ধরনের বিধি-নিষেধের কারণ কুরআনের সূরা আহযাব এর ৫৯ তম আয়াতটি থেকে জানা যায়–

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۔

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে বলুন এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

একটি উদাহরণের সাহায্যে আয়াতটি হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। ধরুন, একটি পরিবারে জমজ দুই বোন আছে। তারা উভয়েই বেশ সুন্দর। মুম্বাই-এর কোনো একটি রাস্তা দিয়ে তারা দুজনেই পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল, তাদের একজনের পূর্ণাঙ্গ হিজাব এবং অপরজন পরেছে মিনি স্কার্ট। মেয়েদের উত্যক্ত করার জন্য, এ অবস্থায় পথে যদি একজন মাস্তান বা বখাটে ছেলে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে ঐ ছেলেটি কোন মেয়েটিকে উত্যক্ত করবে? স্বাভাবিকভাবেই বখাটে ছেলেটি ঐ মেয়েটিকেই উত্যক্ত করবে যে মিনি স্কার্ট পরে আছে। এ কারণেই পবিত্র কোরআনে নারীদের হিজাব পালন করতে বলা হয়েছে, যেন তাদেরকে কেউ উত্যক্ত না করে।

অবশ্য কোনো মুসলিম নারী, তারা যখন মাথায় স্কার্ফ পরেন বা চাদর দিয়ে গা ঢেকে রাখেন কিংবা হিজাব পরেন তখন তাদের দিকেও তো অন্যরা তাকিয়ে থাকে এবং এভাবে বিনা কারণে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেকেই এ ধরনের অযুহাত পেশ করতে পারেন।

এর উত্তর হলো, এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। কেননা তিনি এমন পরিবেশে হিজাব পরেছেন যেখানে অনেকে হিজাব পরেনি। এক্ষেত্রে কোনো পুরুষ হিজাব পরিধানকারী মহিলার দিকে তাকায় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে, লোলুপ দৃষ্টিতে নয়। বরং পুরুষরা মিনি স্কার্ট পরা মহিলার দিকেই লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়।

হিজাব পরিধানের ক্ষেত্রে, বোরকাটা কালোই হতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। ইসলামী শরিয়তের কোথাও এ কথা বলা হয়নি। বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ না করার শর্তে, বোরকা যেকোনো রঙেরই হতে পারে; যেমন ঃ বাদামি, নীল বা সাদা রঙের বোরকা ইত্যাদি।

কুনিয়াত বা সম্পর্কিত নাম

এখন নজর দেয়া যাক কুনিয়াত বা সম্পর্কিত নাম প্রসঙ্গে। হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনী পাঠ করলে জানা যায় তিনি কখনও পরিবারের পদবী বদলাতে বলেননি। কারণ পরিবারের পদবি বংশের পরিচয় বহন করে। ইসলামে বংশের পরিচয়টা গুরুত্বপূর্ণ।

এমন অনেক মুসলিম আছেন যাদের নামের পদবীটা অমুসলিমদের মতো, বিশেষ করে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের মুসলিম দেখা যায়। যেমন ঃ কোনকানী অঞ্চলের মুসলিম ও হিন্দু উভয়ের নামেই ঠাকুর, প্যাটেল, গাভাস্কার ইত্যাদি উপাধি বা পদবী পাওয়া যায়। অনুরূপ গুজরাট অঞ্চলে আছে শাহ, দেশাই ইত্যাদি। এক্ষেত্রে পদবী দেখে লোকটি মুসলিম নাকি হিন্দু বোঝার উপায় থাকে না। তবে পদবী দেখে লোকটি কোন অঞ্চলের তা বুঝা যায়। এ কারণে, কারো নামের পদবীটা অমুসলিমদের মতো হলে কোনো সমস্যা নেই। তবে তাদের নামের প্রথম অংশটা এমন হওয়া উচিত যেন মুসলিম হিসেবে তাদের সহজে চেনা যায়। যেমন ঃ আবদুল্লাহ, সুলতান, মুহাম্মদ, জাকির ইত্যাদি। কিন্তু এক ধরনের সুবিধাবাদী মুসলিম আছে তারা পরিস্থিতির সুবিধা নিতে নামের পদবিটা অমুসলিমদের মতো ঠাকুর বা প্যাটেল রাখেন। ধরা যাক, কারও নাম মুহাম্মদ নায়েক। এখন সে যদি একজন সুবিধাবাদী মুসলিম হয়, তবে সে কোনো মুসলিমের সাথে দেখা হলে তার পুরো নাম বলবে, কিন্তু অমুসলিমের সাথে দেখা হলে বলবে এম. নায়েক অর্থাৎ, মুহাম্মদ নায়েক। এক্ষেত্রে এম. নায়েক বলতে মনোয়ার নায়েক বা মনোজ নায়েক উভয়ই হতে পারে। অর্থাৎ, যেন নাম শুনে বুঝা না যায় যে সে অমুসলিম নাকি মুসলিম এবং এভাবে সে পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করে। সে ব্যবসায়ী হলে এভাবে হয়তো সে মুসলিম, অমুসলিম দু'ধরনের কাস্টমারই অধিক পরিমাণে পাবে। কিন্তু এভাবে পরিচয় গোপন করা এক ধরনের প্রতারণা। অথচ ইসলামে প্রতারণা নিষিদ্ধ।

সুতরাং নামের পদবীটা কিংবা নামটাও যদি অমুসলিমদের মতো হয় কোনো সমস্যা নেই। অবশ্য নাম গোপন করে সুবিধা গ্রহণের সুযোগ ইসলামে নেই। বরং একজন মুসলিমের তার মুসলিম পরিচয় দিয়ে গৌরব বোধ করা উচিত।

লেবেলের উপকারিতা

প্রতিটি স্কুলের একটি বিশেষ ইউনিফর্ম থাকে যা দেখলে বুঝা যায় যে ছেলে বা মেয়েটি কোন স্কুলে পড়ে। যেমন ঃ ভারতে সেন্ট পিটার্স স্কুলের ইউনিফর্ম হলো ছাইরাঙ্গা প্যান্ট আর সাদা শার্ট। কেউ এ ধরনের পোশাক পরলে সাথে সাথে বুঝা যাবে সে সেন্ট পিটার্স স্কুলের ছাত্র। এমনিভাবে Islamic Research Foundation তথা IRF এরও একটি নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম আছে। আর তা হলো দাড়ি ও টুপি। ইসলামের লেবেলটাকে IRF তার লেবেল হিসেবে বেছে নিয়েছে। যারা শিক্ষানবিস চিকিৎসক তারা উত্তীর্ণ হবার আগ পর্যন্ত তাদের নাম যাই থাকুক পাস করার পর তার নামের আগে ডা. শব্দটি যুক্ত হয়। যেমন– মি. নায়েক থেকে ডা. নায়েক। এটি একটি সম্মানজনক পদবি। কারও নামের সাথে ডাক্তার শব্দটা শুনলে মানুষ বুঝতে পারে তার কাছ থেকে চিকিৎসা পাওয়া যাবে।

সুতরাং যদি এই বিশেষ ভূষণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য বোঝা যায় তবে সেটাই পরা উচিত। একজন মুসলিমের নিজের পরিচয় নিয়ে গর্ব করা উচিত। হতে পারে, একজন মুসলিম যদি দাড়ি রাখে এবং টুপি পরে তাহলে কোনো ব্যক্তি যার আধ্যাত্মিক সাহায্যের প্রয়োজন তিনি ঐ ব্যক্তিটির কাছেই যাবেন অধিকন্তু যার মাথায় টুপি এবং মুখে দাড়ি আছে।

ইসলামি লেবেল ধারণ করলে আল্লাহ ও রাসূলকে মানার কারণে আপনি তো সাওয়াব পাবেনই অধিকন্তু এই লেবেলের অন্যান্য উপকারিতাও আপনি পেতে পারেন। যেমন ঃ কোনো মুসলিম যদি নতুন কোনো এলাকায় যায় এবং এ সময় নামাযের সময় হয়ে যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তি দেখতে মুসলিম এমন ব্যক্তির কাছেই মসজিদের ঠিকানা জানতে চাইবে। সুতরাং সে দাড়ি ও টুপিওয়ালা কোনো ব্যক্তির কাছেই মসজিদের ঠিকানা জিজ্ঞেস করবে। আবার, ঐ ব্যক্তি যদি এমন এলাকায় যায় যা অমুসলিম অধ্যুষিত এবং যেখানে হালাল খাবারের সন্ধান পাওয়া মুশকিল। সেক্ষেত্রেও ব্যক্তিটি এমন একজন লোককেই বেছে নেবে যার দাড়ি আছে এবং যিনি টুপি পরেন। কারণ এমন লেবেলের কারণে তাকে মুসলিম মনে করা যায়।

ইসলামি লেবেলের আরো একটি উপকারিতা হলো, কোনো বাড়িতে যদি এমন কোনো পোস্টার টাঙানো দেখা যায় যেখানে আরবিতে লেখা– هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ বা رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا অথবা اَللّٰهُ اَكْبَرُ তাহলে সহজেই বুঝা যাবে এটি একটি মুসলিমের বাসা। কোনো অফিসের দেয়ালে অনুরূপ কোনো পোস্টার টাঙানো দেখলে বুঝা যায় যে, এই অফিসের মালিক একজন মুসলিম। এমনিভাবে কোনো

গাড়িতে যদি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লেখা স্টিকার লাগানো থাকে তাহলে বুঝা যাবে গাড়িটি একজন মুসলিম ব্যক্তির। এসব ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির যদি একজন মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে সে সহজেই তাকে খুঁজে পাবে।

আবার এরকম লেবেলও আছে যার কারণে কোনো দোয়াও শেখা সম্ভব হতে পারে। যেমন ঃ কোনো গাড়িতে যদি এ ধরনের যন্ত্র লাগানো থাকে যে গাড়ি চালু করা মাত্র তা বলতে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (স) এর শেখানো দোয়া- 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, সুবহানাল্লাহ আল্লাহুম্মা সাখখারালানা হাজা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনিন' এবং দোয়াটি যদি বারবার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, সেক্ষেত্রে দোয়াটি যার মুখস্থ নেই তিনিও শিখে নিতে পারবেন। প্রযুক্তির কল্যাণে এ ধরনের আরও অনেক লেবেল তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও কোনো অমুসলিমপ্রধান এলাকায় যদি মিল্লাত নগরী নামে একটি শহর থাকে যেখানে বিভিন্ন বিল্ডিং এর নাম আল মদিনা, আল মাক্কাহ, আরাফাহ ইত্যাদি থাকে তখন সহজেই বুঝা যাবে এটি একটি মুসলিম নগরী।

লেবেল বিশ্বাসের স্মারক

লেবেল প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তির বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে। যার কোনো গুণ বা মূল্যায়ন নেই তার লেবেলের প্রয়োজন হয় না। কেননা লেবেল দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে। একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি বিশ্বাসের স্মারক। আর পরিচয় প্রকাশ করতে ভয় পাওয়া কিংবা পরিচয় গোপন করা অনুচিত। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীনবদর্শন, হৃদয়ে এরূপ বিশ্বাসের প্রগাঢ়তার অভাবেই একজন মুসলিম তার পরিচয় গোপনের মতো হীনম্মন্যতায় ভুগেন।

কিন্তু যদি কেউ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অবগত থাকেন আর নির্দেশগুলো মেনে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেন তবে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফল হবেন ইনশাআল্লাহ। আর তাইতো কুরআনুল কারীমে সূরা বনী ইসরাঈল এর ৮১ তম আয়াতে মহান রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন –

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ـ

অর্থঃ সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী।

সার্বিক পর্যালোচনায় বলা যায়, ইসলামিক লেবেল কেবল মুসলমানদের আদর্শ-বিশ্বাস ও মূল্যবোধকেই উপস্থাপন করে না; এটি মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বকেও প্রতিভাত করে। সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দরের সীমারেখাকেও করে দৃশ্যমান ।